সপ্তম অধ্যায়

# বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতায় প্রসাধনকলা — শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দ

জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিল্‌কে একজন কবি, 'প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের কবি'। রিল্‌কে একদা রঁদ্যা[১] সহকারী ছিলেন। রঁদ্যা একজন ভাস্কর। কবি যখন ভাস্করের সঙ্গে মেলেন তখন তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে ভাস্করের কথা। রিল্‌কের মধ্যে রঁদ্যার প্রভাব ছিল। আর কবি বীতশোক ভট্টাচার্য নিয়েছেন রিলকের 'বস্তুদর্শন'। তাঁর বেশ কিছু কবিতাতে 'বস্তু'র কথা আছে। 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থের 'দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা' কবিতাতে 'বস্তু'র স্বীকৃতি পাই :

"তোমাকে যে দুঃখ দিই তাও আর বেশিদিন সইতে হবে না;
এ নাও আমার দুঃখ : এই ব'লে আমি যেই ও করকমলে
হাতের পাতায় ভ'রে বিন্দু বিন্দু ব্যথা দিই, সব জল জলে
অদ্ভুত মিলিয়ে যায়, যেন জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত বেদনা
রাত্রির প্রতিমাটিকে অন্ধকারে ডেকে আনো, তবু বিষণ্ণতা
চিত্রিত প্রচ্ছায়সম কেন মূর্তি ঢেকে আসে তামস পেখমে :
সে কিছু জানে না, বোকা; সে তো কুহু, সিনীবালী, ব্যথা উপশমে
নিঃশব্দ সহায়; শুধু রাত্রিদিন ভাঙে দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা।"[২]

('দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা', 'অন্যযুগের সখা')

এখানে 'দুঃখ' একটা বস্তু। আবার বস্তুটা মিলিয়ে যাচ্ছে জলের ভেতর জল হয়ে। এবং সেই সঙ্গে আসছে 'জলাঞ্জলি' শব্দটি জলে অঞ্জলি দেওয়া। দুঃখ'টা হচ্ছে জল। অনেক দুঃখের মাঝখানে আরও একটু দুঃখ ভাসিয়ে দেওয়া হল। সুখ-দুঃখ আপেক্ষিক। জীবনের প্রাণের সঙ্গী সুখ দুঃখ। 'রাত্রির প্রতিমা' অন্ধকারের কোনো ভাবনা হতে পারে অথবা রাত্রির প্রতিমা' জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতোও হতে পারে :

'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'[৩]

('বনলতা সেন', জীবনানন্দ দাশ)

দুঃখ থেকে এল বিষণ্ণতা। বিষণ্ণতা প্রেমেরই একটা দিক। সে মূর্তিটি রাত্রির অন্ধকারেই ঢেকে আছে অর্থাৎ 'তামস পেখম' ঢাকা সে মূর্তি। যার পেখম আছে সে ময়ূর। কেকা হল ময়ূর বাণী বা ময়ূরের ডাক। এখানে ডাকটাই হল মূর্তি। সে মূর্তি অন্ধকারের মতো, 'কুহু' শব্দের অর্থ অমাবস্যা সিনীবালীর সহচরী কুহু অর্থাৎ অন্ধকার অমাবস্যা। আবার হতে পারে পিকের রব :

"যেমতি মধুর স্বপ্নময়, কুহুময় প্রেম।"[৪] ('মন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

এখানে কুহু রাত্রির আভাস আবার কোকিলের ডাক। এই ডাকটাই কবির কবিতায় বস্তু এবং বস্তুগুলো প্রাণ নিয়ে ফিরে আসছে।

'সিনীবালী' ঋক্‌বেদের দেবী, অঙ্গীরার পত্নী, শ্রদ্ধার কন্যা। 'সিনীবালী' শব্দের অর্থ চন্দ্রকলা। ইনি গর্ভের দেবী, বাচ্চা শিশুদের রক্ষাকারী দেবী। ঋক্‌বেদে সিনীবালীকে বলা হয়েছে তিনি সুবাহু, সুন্দর, অঙ্গুলীবিশিষ্ট, সুপ্রসবিনী এবং বহু প্রসবিত্রী। এই লোকপালিকা সিনীবালীর উদ্দেশ্যে ঋক্‌বেদের ঋষিরা হব্য প্রদান করেছেন। সিনীবালীকে কেউ কেউ বলেন রাকা অর্থাৎ পূর্ণিমা। আবার কেউ কেউ বলেন 'সিনীবালী' এবং 'কুহু' উভয়ই অমাবস্যা। কবিতার যাত্রা দুঃখ থেকে জলে, দুঃখ থেকে বিষণ্ণতার দিকে। জল এবং বিষণ্ণতা উভয়ই ডেকে আনছে অন্ধকার মূর্তি যার রূপটা স্পষ্ট নয় অর্থাৎ ময়ূরের ডাকের মতো। ময়ূরের ডাককে কল্পনা করা হচ্ছে কুহু এবং সিনীবালী দুই দেবীর মধ্য দিয়ে। এরাই ব্যথা উপশমের নিঃশব্দ সহায়। দুঃখ চারিয়ে দেওয়া হল। ঋক্‌বেদ থেকে চলে এল। আমাদের ঐতিহ্যে কবিতাটি লগ্ন। রিলকের মধ্যেও যেন গ্রীক, লাতিন ঐতিহ্য। দুঃখ এখানে বস্তু হয়ে উঠল দুই দেবী – একজন কুহু, একজন সিনীবালী।

কিন্তু কবি বীতশোক ভট্টাচার্য রিলকের 'বস্তুদর্শন'এর মধ্যে আটকে থাকেননি। তিনি শব্দ নিয়ে এগিয়ে গেছেন আরও অনেক দূর।

শব্দ যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।সেখান থেকে যেন কবিগণ শব্দ সংগ্রহ করেন, যা কবিতার সব থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান। তাতে তাঁরা আপন মনের মাধুরী মেশান। গড়ে তোলেন কবিতা। কবিতায় একটা শব্দের টানে আরেকটা শব্দ উঠে আসে চাকার গায়ে চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতার ধরণও এইরকম। একটা প্রসঙ্গের টানে উঠে আসে আরেকটা অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতায় আছে শব্দের বহু অর্থ। শব্দের এক অর্থ থেকে অন্য অর্থে যাওয়া কবির কাব্যরচনা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব চিন্তাভাবনা নিয়ে

বহু অর্থের শব্দ দিয়ে কবি তৈরি করেন 'জলের তিলক' গ্রন্থের 'ঈশ্বর' কবিতা। যেন গোটা কবিতাটাই একটা শব্দ :

"পাগল সে, কার সঙ্গে কথা বলে চলে।

কথা নেই। পেছনের পথে প'ড়ে ছুঁড়ে-দেওয়া নুড়ি ও পাথর।

পেছনে কুকুর হাঁটে ভুক ভুক। সঙ্গী নেই কোনও।

আছে শুধু পাথর, কুকুর।

যদি বলো প্রস্তর, কুক্কুর। —

পাথর, কুকুর সব শুদ্ধ হবে ? সাধুভাষা হবে ?

শব্দ সব ছুঁড়ে-দেওয়া, লেলিয়ে দেওয়ার।

ঈশ্বর আলাপ করে তার সঙ্গে চলতি-ভাষায়।[৫]" ('ঈশ্বর' , 'জলের তিলক')

কবিতাটি ইতিহাস, এটি ভবিষ্যতের। 'প্রস্তর', 'কুক্কুর' শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়। এ শব্দ দুটোকে চলিত ভাষায় আমরা বলি 'পাথর' আর 'কুকুর'। 'পাগল' যিনি উত্তর ভারত থেকে পূর্বভারতে ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। ঐহিক বা ইহ জাগতিক স্বার্থের ধান্দা ছেড়ে সাধারণ মানুষের মতো কোনো লাভালাভের প্রশ্ন মাথায় না রেখেই তাঁর এ প্রচার। জৈন সাধুরা প্রাকৃত ভাষায় তাঁদের ধর্মগ্রন্থ লেখেন। বুদ্ধদেবও পালি ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লেখেন। পালি ভাষা, প্রাকৃত ভাষা ছিল সেদিন সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। কিন্তু তার পূর্বে ঈশ্বর বিরাজ করতেন সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায়। যেমন-লাতিন ভাষায় লেখা হয়েছিল 'বাইবেল'। যখন সংস্কৃত বা লাতিন ভেঙে তৈরি হল আঞ্চলিক ভাষাগুলি এবং সেই আঞ্চলিক ভাষাতেই শুরু হল ঈশ্বরের গুণগান। কিন্তু রক্ষণশীলদের পক্ষে ব্যাপারটা তা ছিল না। তারা লাতিন বা সংস্কৃতকেই দেবভাষা মনে করতেন। আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ হয়েছে ঠিক তেমনই ইউরোপের ইতিহাসেও আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে (যেমন – ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংরেজী) অনূদিত হয়েছে বাইবেল।

প্রাচীনকালের মানুষের পাথর ছিল অন্যতম হাতিয়ার। অন্য কোনো খনিত্র তাদের কাছে ছিল না তখন। পশুপাখি শিকার, গাছের ডালকাটা, লতাপাতা থেঁতো করা ইত্যাদি কাজ তারা করত পাথর দিয়ে। কুকুর পুরোনো দিন থেকেই মানুষের বন্ধু। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে

কুকুর ছিল প্রধান বন্ধু। তিনি হেঁটেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে, পাথরের উপর দিয়ে হিমালয় পর্বতে।

মহাবীর যখন বঙ্গদেশে আসেন তখন 'লাড়হ ভূমি' (বঙ্গভূমিকা / সুকুমার সেন) বর্তমানে যা রাঢ় নামে পরিচিত, এখানকার লোকজন তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়েছিল এবং কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। আমরা কিন্তু মুখের শব্দগুলিকে পরস্পরের দিকে লেলিয়ে দিই যেমন কুকুরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। 'লেলিয়ে' শব্দের সঙ্গে লেহনের সম্পর্ক আছে। লেহন হয় জিভ দিয়ে আবার লেলানো হয় জিভ দিয়ে। জিভ না থাকলে শব্দসৃষ্টি করা হত না। যে পাগল সে কেবলই বকে, তার বুকনির মধ্যে যে কথা থাকে সেগুলো কোনটার অর্থ আছে, কোনটা অর্থহীন। ফরাসী দার্শনিক (একালের) মিশেল ফুঁকো (১৯২৬-১৯৮৪) পাগলের সব কথার অর্থ খুঁজে পান। তিনি পাগলের মধ্যে দেখেছিলেন প্রকৃত মানুষকে যাঁরা গণ্ডীর বাইরে উপস্থিত। তিনি পাগলের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যেই স্বাধীনতা খুঁজে পান। যে ঈশ্বরের কথা বলে সে পাগল। সাংসারিক বুদ্ধি তার নেই বলেই অসাংসারিক কাজ কর্মে সে গেছে। সংসার বুদ্ধি থাকলেই সে সুখী হত। নিয়মের বেড়াজালে থাকলেই সুখী হত। পাগলের মুখে চলিত ভাষাই আছে। সবকালে, লাতিন বা সংস্কৃত ভাষা নেই আর চলিত ভাষাতেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। যত সাধক তাঁরা সবাই পাগল। তার প্রমাণ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের মতো ব্যাপক এ কবিতা। ইতিহাস, সমাজ, পশুচরিত্র সমস্ত কিছুই এ কবিতা তুলে ধরেছে।

কবি শব্দশিল্পী। তিনি শব্দ দিয়ে আঁকেন ছবি। 'জলের তিলক' গ্রন্থের 'খরা' কবিতায় বাংলা শব্দের ব্যবহার পাঠককে সচকিত করে :

"দিন শুরু হলে তুমি স্বপ্নের ঘোরে
শাদা পদ্মের মতো বেসিনের কাছে
নামিয়ে এনেছ শাদা পদ্মের মুখ।

ঘুমে ভরা তুমি নেমে এসে খুব ভোরে
শাদা পদ্মের মতন দু'হাতে ঐ
শ্বেত পদ্মটি সাজিয়েছ যেই ভাসে

পদ্মটি নেই, আজ থেকে জল নেই,

তুলে ধরো ঘামে কান্নায় ভেজা মুখ।[৬]'' ('খরা' , 'জলের তিলক')

আট পংক্তির কবিতাটিতে 'শাদাপদ্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে চারবার, কবিতার ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তিতে। শ্বেত পদ্মকে বলা হয় পুণ্ডরীক। চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য অনূদিত 'সাহিত্য একাডেমী' থেকে প্রকাশিত ধর্মানন্দ কোশম্বীর লেখা 'ভগবান বুদ্ধ' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বলেছিলেন 'পুণ্ডরীক ভবঃ'। শাদা পদ্মের জন্ম পাঁকে। পাঁকে জন্ম হলেও শ্বেতপদটি প্রস্ফুটিত হয় স্বচ্ছ ফুল হিসেবে। বুদ্ধদেবের মতে পাঁকে জন্ম হোক কিন্তু প্রস্ফুটিত হতে হবে পদ্মফুলের মতো। শ্বেত পদ্ম স্মরণ করিয়ে দেয় রাত্রি শেষ হয়ে দিন শুরু হওয়ার কথা। রাত্রি পাঁকের মতোই মলিন। দিন শ্বেত পদ্মের মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার, উজ্জ্বল। রাত্রি শেষ হয়ে দিন শুরু হলে রাত্রির কালিমা ঘুচিয়ে শ্বেত পদ্মের মতো উজ্জ্বল মুখ 'তুমি' সর্বনামের কোনো একজন 'বেসিনের কাছে নামিয়ে এনেছে' ধোওয়ার জন্য। মুখ ধোওয়া প্রাত্যহিক কাজ। মুখ ধোওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে শ্বেত পদ্মের মতো বিকশিত করার কথা বলেছেন কবি।

শ্বেত পদ্ম মনে করায় ভরা ঘুমের। ঘুমের মধ্যে থাকে স্বপ্নের ঘোর। স্বপ্ন অবাস্তব। ঘুম বাস্তব। ঘুম ভরা চোখে নির্ভেজাল ভোরবেলায় 'শাদা পদ্মের মতন' দুটি হাত নিয়ে সাজিয়েছে শ্বেদ পদ্মটি। সাজানো পদ্মটি ভাসতে চাইলে আর তা নেই। কবিতার ৭ম পংক্তিতে 'জল' শব্দের ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন জলই জীবন। জল ছাড়া যেমন জীবন বাঁচে না একইভাবে জল ছাড়া পদ্ম বাঁচে না। জল নেই অর্থাৎ 'খরা'। খরার অনুষঙ্গ হিসেবে আসবে 'জ্বরা' শব্দটি। 'জ্বরা' যেমন মানুষকে জীর্ণ করে, খরাও তেমনি প্রকৃতিকে জীর্ণ করে দেয়। 'জল' শুকিয়ে গেলে পদ্ম ভাসতে পারে না, তাঁর মৃত্যু হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও জীবনের জল শুকিয়ে গেলে হাসতে ভুলে যায়, তখন আর জীবন থাকে না। জল না থাকায় বিষয়টি মনে করিয়ে দেয় বর্ণহীন বেদনাকে। কবি জানেন কবিতাটিতে জীবনকে ঘিরে আছে নিঃসঙ্গতা। শাদা পদ্মের মত মুখ ভিজে গেছে ঘামে আর কান্নায়। একা থাকার লড়াই করতে করতে হয়তো শেষে মিশে যেতে হয়।

কবির কবিতা যেন জেন গুরুর শিষ্যকে দেওয়া ধাঁধা লাগানো এক একটা প্রশ্ন, অর্থাৎ কোয়াণের মতো। শিষ্য দিনরাত সেই প্রশ্নের অর্থাৎ কোয়ানের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তাঁর কবিতায় একটি পংক্তির সঙ্গে অন্য পংক্তির অথবা শব্দ ও বাক্যের কোনো মিল

নেই। যেন ম্যাজিকের মতো :

"পাগলের মতো মুখে দই মেখে স্তব্ধ বসেছিল কলকাতার সন্ধ্যা
গরমকালে বড়ো বড়ো ফোড়া হয়েছিল তার
তুমি পরিয়ে দিয়েছিলে তোকমারির ঠুলি
ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সতেরোতলা বাড়ি, গলগল
বেরিয়ে এসেছিল বৈদ্যুতিক আভা
টলতে টলতে গুমটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল শেষরাত্রির ট্রাম
লাল আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়েছিলে তাকে তুমি
মৃত্যুর দিকে নিয়েছিলে ধ্বংসের দিকে
দিগন্তে, নীল দিগন্তে, গাইতে গিয়ে হারমোনিআমের
রিডের উপর লাফিয়ে উঠেছিল তরুণী মেয়েরা
লাফিয়ে উঠেছিল বাড়ির ছাতে ঝুঁকে পড়েছিল তেতলার বারান্দায়
এতো ফুলের আগুন দ্যাখে নি কোনোদিন কেউ এমন আগুনের ফুলকি
নক্ষত্রের মতো ঝরে পড়েছিল মনুমেন্টের মাথার ওপর তোমাদের ক্লান্ত নির্মাণ।"[৭]

('আমাকে তোমরা' , 'অগ্রন্থিত কবিতা')

আমাদের দেশে জাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক[৮] ছিল। আজও ম্যাজিক আছে। ম্যাজিক পেয়ে বসেছে এ কবিতার বাক্য এবং শব্দগুলোকে। দীর্ঘ এ কবিতায় একটি পংক্তির সঙ্গে অন্য পংক্তির অথবা শব্দগুলোর কোনো মিল নেই। এই মিলহীন পংক্তিগুলির ভেতর দিয়ে পাঠক জেনসাধকের মতো অর্জন করবেন অদ্ভুত এক অনুভূতি। যেমন ম্যাজিসিয়ানের আঙুলের নির্দেশে পুতুল নাচে। কবিতাটি পাঠের পর পাঠক এক জগতে উত্তরিত হন, যেখানে আছে ম্যাজিক, ম্যাজিকটি সুতোহীন পুতুলের নাচ।

'শিল্প'কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলিতে ভাষার ধরণ কিছুটা ভিন্ন। এখানে একটি শব্দই সমন্বয় সাধন করে একাধিক শব্দের মধ্যে :

"জেগে উঠেছিল, একাকী, পঙ্ক যুবতী;
তরুণ বাতাসে বক্ষ, জঙ্ঘা দোলাচল;
স'রে যাও; তবু কামড়িয়ে ধরি ও কটি;

আমরা, তোমার কীটরাশি, তুমি রাঙা-ফল।

দোলো, স'রে যাও; যা তোমার সম্পর্ক

লতায়-পাতায়, আত্মীয় এত, অজানা !

তবু দুলে ওঠো, যেন আলো, নীল স্বর্গ

তোমাকেই ডাকে; অপ্রাপনীয়া তুমি, মা।

লাবণ্যলতা, ভর করো দেহযষ্টি';[৯] ('ফল' , 'শিল্প')

'পক্বযুবতী' শব্দটির যৌবনের অনুষঙ্গে আসে 'রাঙাফল' শব্দটি। ফলের মধ্যে থাকে বীজ, বীজ থেকে হয় গাছ, গাছের লতাপাতা। আবার কথায় কথায় ব্যবহৃত হয় 'লতায়-পাতায় আত্মীয়' কথাটি। আত্মীয় অজানা বলে মনে হলেও সম্পর্কের সিঁড়ি বেয়ে লতার মতো লতিয়ে উঠলে দেখা যায় সকলেই আত্মীয়। 'রাঙা' শব্দটি ইঙ্গিত দেয় সুদূর আত্মীয়তার – 'রাঙাপিসি', 'রাঙাদিদি', 'রাঙামামি' ইত্যাদি সম্পর্কের, যাঁরা লাবণ্যময়ী, 'লাবণ্যলতা' শব্দটি তুলে ধরে অপ্রাপনীয়াদের যারা লতার মতো দুলে ওঠে আলো ও নীল স্বর্গের ডাকে।

কবি কবিতায় শব্দকে ভেঙেছেন, দিয়েছেন তার বহুমাত্রিক অর্থ। 'জলের তিলক'এর 'অর্পণা' কবিতার ৩ পংক্তি ও ৪ পংক্তিতে শব্দ প্রয়োগের নূতনরূপ দেখিয়েছেন কবি নিপুণভাবে :

"সিদ্ধ বকুল গাছ মন্দিরের – বকুলের গন্ধে বন্যা এলে

হাত দিয়ে শাখা টেনে, কাণ্ডে গর্হিত ঝাঁকি দিয়ে,"[১০]

('অপর্ণা' , 'জলের তিলক')

এখানে 'সিদ্ধ বকুল' প্রেমিকার চিত্রস্বরূপ যে কাঙ্ক্ষিত, নিষ্পাপ। মন্দিরের বকুল গাছকে সিদ্ধ হতেই হয়। বকুলের গন্ধ যৌবনগন্ধ। তার মন প্রায় সময়ই ব্যাকুল। গন্ধের তীব্রতা বন্যার মতই উত্তাল, প্রতিরোধহীন। এক নিমেষে ভাসিয়ে দিতে পারে জাত-কুল-মান। ৪র্থ পংক্তির 'গর্হিত' শব্দটির দ্বারা বোঝায় অপরাধ করা। গাছের কাণ্ডে ধাক্কা দেওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনই গর্হিত। ডালপালায় হালকা ঝাঁকুনি দিলেই চলে।

**চিত্রকল্প —**

১৯১৪ সালে এজরা পাউন্ডকে কেন্দ্র করে কয়েকজন কবি 'ইমেজিস্ট পোয়েট্রি' নামে

একটি আন্দোলন শুরু করেন। এঁরা এই আন্দোলনের নাম দিলেন ইমেজিজ্‌ম 'Imagisme'।[১১] বলাবাহুল্য এই আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশে পৌঁছেছিল। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র' : রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা'[১২] নামে একটি গদ্য লেখেন। তিনি 'Image' শব্দটিকে বাংলা বাক্‌প্রতিমা পরিভাষায় রূপান্তরিত করেন। এরপরেও তিনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা নিয়ে একটির পর একটি গদ্য লেখেন। অমলেন্দু বসুর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ১৯৯৬ খৃঃ 'চিত্রকল্প বিচার : আর একটি ভূমিকা'[১৩] নামে বাংলা 'আকাদেমি পত্রিকা'য় একটি গদ্য লেখেন। উপরোক্ত লেখকদের মূল কথা : 'Image' শব্দটির অর্থ আকার বা রূপ বা প্রতিমা। 'Image' থেকে আসছে আধুনিক 'Imagery' শব্দটি। 'Imagery' কথার অর্থ হল 'চিত্রকল্প'। পদ্যে, গদ্যে, কাব্যে এবং কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ দেখা যায় সমানভাবে। সাহিত্য প্রকাশ করে অনির্বচনীয়কে। ভাষার মাধ্যমে যে কথা বলা যায় না ছবির মধ্য দিয়ে তা বলা হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাগর্ভ। আর এই ব্যঞ্জনা আসে চিত্রপ্রয়োগের মাধ্যমে। ভাষার মধ্য দিয়ে আঁকা চিত্রই চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা অর্থাৎ বাক্য দিয়ে রচিত প্রতিমা। ছবির পর ছবি সাজিয়ে বিমূর্তকে বা কোনো ধারণাকে রূপ দেওয়া হয় আবার মূর্তকেও বিমূর্ত করা হয়। তবে চিত্রকল্পকে ব্যঞ্জনাবাহী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চিত্রকল্প অলঙ্কার হতে পারে আবার নাও হতে পারে। উপমা, উৎপেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি অলংকারে চিত্রকল্পের প্রয়োগ দেখা যায়।

আমরা সরল কথায় যা বুঝি কবি কবিতায় শব্দের মাধ্যমে চিত্রের আভাস দেন, চিত্রের বর্ণনা রাখেন এবং চিত্রটিকে ব্যঞ্জনায় উত্তরিত করেন। আমাদের দেশে পুরোনো দিনের সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং পুরোনো বাংলা কবিতায় কিংবা 'বৈষ্ণব পদাবলী' 'মঙ্গল সাহিত্যে' এই ইমেজ বা বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প ছিল। রসবাদী বা ধ্বনিবাদী আলংকারিকরা 'চিত্রকল্প' না বললেও আলোচনা রেখেছেন প্রচুর। শ্রদ্ধেয় অতুলগুপ্ত-এর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইতে এমন নমুনা বিস্তর। যদিও আমরা চিত্রকল্প প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করি মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে।

বিষয়টিকে এভাবে দেখা ভাল: মাইকেল মধুসূদন ইন্দ্রজিৎকে বলছেন 'রাবণি'। লক্ষণকে বলেছেন 'সৌমিত্রি', রামকে বলেছেন 'দাশরথী'। এই শব্দগুলির পিছনে ইন্দ্রজিৎ, লক্ষণ বা রাম-এর পিতৃবংশ অথবা গোটা মাতৃবংশ উপস্থিত হচ্ছে। অর্থাৎ একটি শব্দ সে বিশাল একটা

ইতিহাসকে তুলে আনছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বলছেন :

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে।'[১৪] ('নববর্ষা' , 'ক্ষণিকা')

আমরা বুঝতে পারি ময়ূরের নৃত্যের সঙ্গে কবির হৃদয় নৃত্য একাকার হয়ে গিয়ে বিশেষ ঋতুতে একটি আনন্দের সংবাদ পরিবেশন করতে চাইছে। এ আনন্দ চিত্রের আভাসের। মাইকেল মধুসূদন দত্তও চিত্রের আভাস দিচ্ছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন 'বিজয়িনী' কবিতাতে লেখছেন :

'' . . . । সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে,
শ্বেতশিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে — বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসটিরে
করিছে সোহাগ; নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানাদুটি, লম্বগ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ – 'পরে কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী, কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশবিভোর।"[১৫] ('বিজয়িনী' , 'চিত্রা')

এখানে কবি শব্দচ্ছবিগুলির মধ্যে বর্ণনা রাখছেন। এবং ছবিগুলি রূপ থেকে অরূপের দিকে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। অর্থাৎ আমরা অতীতকাল থেকে বর্তমানের বিজয়িনীকে দেখছি আবার বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরে চলেছি। ছবিগুলি যেন শ্রুতি, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ নিয়ে হাজির হয়েছে। পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কবিতায়ও এমনটা ঘটেছে :

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু বেলা

নির্জন মাছের চোখে পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে,

পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ – মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;"[১৬]

('মৃত্যুর আগে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

কিন্তু জীবনানন্দ এই দৃশ্য – ঘ্রাণ এবং স্পর্শের ছবিকে পেরিয়ে গিয়ে একসময় লেখলেন :

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'[১৭]

('বনলতা সেন' , 'বনলতা সেন')

আপাতদৃষ্টিতে চোখের দুটি পাতার মাঝখানে একটি চোখকে বাঁসায় অবস্থিত পাখির ডিমের মতোই মনে হয়। অর্থাৎ দৃশ্যগত মিল রইল চোখের সঙ্গে বাসায় পড়ে থাকা ডিমের। কিন্তু দৃশ্যের বাইরে যে কথাগুলি থাকে তা দৃশ্যকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের নীড়ে স্নেহ ভালোবাসার পাশাপাশি হিংসা-দ্বেষ-যুদ্ধ আছে, কিন্তু পাখির নীড়ে আছে কেবলই শান্তি। সারাদিন কর্মক্লান্তির শেষে পাখি ফিরে আসে তার বাসায় একটু শান্তির খোঁজে। সেই শান্তিকে কবি বনলতা সেনের চোখে স্থাপন করলেন।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প নিয়ে অনেক রকমের কারিকুরি রেখেছেন তাঁর কবিতায়। কবিতার মধ্যে বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্পকে তিনি বিশ্লেষণ করেন টুকরো টুকরো করে। আবার তা প্রতিস্থাপন করেন। কবিতার গঠনগত রূপ নিয়ে 'জীবনানন্দ' বইএর ভূমিকায় তিনি লেখেন :

"বাংলা সমালোচনার অধিভাষায় বাক্‌প্রতিমা অর্থে প্রযুক্ত চিত্রকল্প শব্দটি অশুদ্ধ, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সে-শব্দের তাৎপর্য ঈষৎ-চিত্র বা ঊনচিত্রবোধক, তাই ব্যাকরণসম্মত পরিবর্তনরূপে কল্পচিত্র শব্দটি এ গ্রন্থে প্রয়োগ করা হলো।"[১৮] ('জীবনানন্দ' , বীতশোক ভট্টাচার্য)

'চিত্রকল্প' এর পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন কল্পচিত্র শব্দটি।

কবির সমগ্র কবিতাই টুকরো টুকরো কল্পচিত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটা চিত্র। 'নানা রঙ, নানা রেখায়' তা পরিপূর্ণ। 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থের 'হরিণ' কবিতার খণ্ড খণ্ড কল্পচিত্রগুলি

পাঠকচিত্তে তৈরি করে এক সামগ্রিক আবেদন :

"কে তুমি আজ হরিণ, যাও, সঘনস্রোতে গগনে
তারা ছিটোও; অদেখা খুর, শাণিতরূপো, অরণি
ও শিঙে জ্বলে : কোথায় জল ? পায়ের তলে ধরণী
সরাও, আর হরিণ ধাও। সোনার কণা নয়নে

সোনার কণা শরীরে আরও এত অনল, হরিণী
নিলয় পায় তবে কোথায় ! কোথাও, কার চরণে
হিরণহার ছিঁড়ে লুটোয়, যা তুমি গেলে আমি নিই,
মালায় গেঁথে — বরণ কী এই রশ্মি খরকিরণে।"[১৯]

('হরিণ' , 'অন্যযুগের সখা')

উপরোক্ত কবিতায় মায়াহরিণীর প্রসঙ্গটি এসেছে চর্যাগীতি থেকে। আবার বাল্মীকি রামায়ণের মায়াহরিণের উল্লেখও আছে এখানে। হরিণ অর্থাৎ যে হরণ করে নেয়। ভুসুকু এর চর্যাগানে হরিণী এসেছিল হরিণকে হরণ করে নিয়ে যেতে অথচ হরিণের মায়ায় বাঁধা পড়ে যায় হরিণী নিজেই। একবিতায় 'অদেখা ক্ষুর', 'শাণিতরূপো', 'হিরণহার', 'রশ্মিখর কিরণ' প্রভৃতি কল্পচিত্র মায়াকেই নির্দেশ করে। 'এই মায়া কিছুই নয়। সে মূর্তিমতী অবিদ্যা।'[২০]

ভুসুকু এর ৬-এর চর্যাগানে আছে :

'হরিণা হরিণীর নিলঅ ন-জানী।'[২১] কল্পচিত্রটি। (চর্যাগান - ৬)

'হরিণ' কবিতাতে কবি দেখিয়েছেন এত আগুনের মাঝে হরিণ এসেছে নিলয়ের বা আলয়ের খোঁজে। কিন্তু পাচ্ছে না, হরিণের নয়নে 'সোনার কণা', শরীরে 'সোনার কণা'। হিরণ্য থেকে হিরণ হারে এসে 'হরিণ' কবিতা স্পর্শ করে চরণ। হিরণহার ছিঁড়ে লুটিয়ে পড়ে চরণে। কথিত আছে সোনার নূপুর চরণে পরতে নেই। কারণ দুটো। এক) স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু। পায়ে পরলে তার ক্ষয় বেশি। দুই) স্বর্ণ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে চরণে স্থান দেওয়া যায় না।

পুরোনো মিথ তিনি নিয়েছেন। তাকে ভেঙেছেন। আবার নতুন করে নির্মাণ করে দেখিয়ে

দিয়েছেন হিরণ হার ছিঁড়ে লুটিয়ে পড়েছে চরণে। বলেছেন সোনার নূপুর পায়ে পরার কথা। একইভাবে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নয়নতারা'তে সোনার নূপুর পায়ে পরার ইঙ্গিত আছে। কবি মালা গেঁথেছেন হরিণ চলে যাবার পর। বরণ করে নিয়েছেন 'রশ্মি খর কিরণে'। চরণ থেকে স্বর্ণলক্ষ্মী উঠে এসেছে গলায়। 'রশ্মি খর কিরণে' কল্পচিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয় উত্তাল সত্তর দশককে। সূর্যরশ্মির প্রখর কিরণেও কবি বরণের কথা ভাবেন। এতো আশ্চর্যের বিষয়। ভুসুক-এর কাব্যময় গীতিকে তিনি নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে গেছেন 'রশ্মি খর কিরণ'-এর দিকে।

কবির কবিতায় কবিতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য চিত্রকল্প। 'নতুন কবিতা'র 'আয়তী' কবিতাটি গড়ে উঠেছে একাধিক কল্পচিত্রের সমন্বয়ে। তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় শানিত হয়ে ওঠে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থানের কল্পচিত্রটি :

'লাল পথ ঘুরে গেছে দূর।
ধীর বেঁকে গেছে জলধারা।
দিগন্তের শেষ থেকে আসছে পথিক।
তারা ফুটল। এক। দুই তারা।

আর এমন ঠাণ্ডা অন্ধকার।
এত চুপ। এখন বধূর
কোলে-নামা এক হাত – ঠিক
তার উপরে একা হাতটির

থেমে যাওয়া। এরকম স্থির।
এরকম নিঃশর্ত জীবন।
আসা থেকে সংসারের পাথরে দাঁড়ানো।
শব্দ নেই। বরণ, বরণ।'[২২] ('আয়তী' , 'নতুন কবিতা')

কবিতার প্রথম স্তবকে আছে তারা ফোটার কথা। সন্ধ্যা পরবর্তী সময়। সারাদিন পরিশ্রম

করার পর 'লালপথ' ধরে 'দিগন্তের শেষ থেকে' হেঁটে আসছে পথিক। সারাদিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে গৃহকর্তা। কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে আছে পথিকের স্ত্রীর ঠাণ্ডা, স্থির, নিঃশর্ত জীবনের চিত্র। জমে উঠেছে ঠাণ্ডা অন্ধকার। যা কবির কাব্যমানস ঢেকে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় শূণ্যতাকে :

'আর এমন ঠাণ্ডা অন্ধকার।'

মানবসভ্যতার প্রথম থেকে উঠে এসেছে এ অন্ধকার। আধুনিক মানুষের চেতনা মন্থিত করে উঠে এসেছে এ অন্ধকার। পরিশ্রমী মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রাম চায়। বিশ্রামের সময় হয় অন্ধকারেই। আবার যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের নিবিড় আশ্রয় অন্ধকার। বধূটির যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিশ্চল-নিঃশর্ত জীবনকে সূচিত করে এ কবিতার 'ঠাণ্ডা অন্ধকার' কল্পচিত্রটি। অন্ধকারের ছদ্মবেশে আসে বিষণ্ণতা, যা মনে করিয়ে দেয় নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতার আক্রমণে মানুষের চেতনা আক্রান্ত হয়। ভেঙে যায় তার অনাবিল আনন্দ, গভীর আশ্রয়। একা পরিত্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভয়ঙ্কর শূণ্যতায়।

নিঃশব্দ, নীরব বধূটি শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করার পরেই দাঁড়িয়েছে সংসারের পাথরে :

"আসা থেকে সংসারের পাথরে দাঁড়ানো।"

পাথর জড় বস্তু। সেখান থেকে কোন শব্দ বেরিয়ে আসে না। আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে পারে অনায়াসে। আবার সংসারও কঠিন জায়গা। এখানে মনে না নিলেও মেনে নিতে হয় বহুকিছু। ভারতীয় নারী জাতি অবলা। তাদের বুক ফাটলেও তারা মুখ ফোটাতে পারে না। নিঃশব্দে তাদের বরণ করে নিতে হয় জগদ্দল সংসারকে, প্রতাপান্বিত গৃহকর্তাকে। আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান কোথায় তার কথাই কবি বলেছেন কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের কল্পচিত্রে। কবির আয়তী নারীটি কখনোই ভাবতে পারে না যে সংসারী হয়েও সংসারের মধ্যে না থেকে নষ্ট মেয়েদের মতো জানালায় ইশারা ছড়িয়ে দেবে।

'আয়তী' শব্দটি মধ্যযুগের কাব্য কবিতায় পাওয়া যায়। গ্রামীণ লোকেরা বলেন 'এও' শব্দটি। সে 'এও' শব্দকে আমরা বলি আয়তী। আচার্য সুকুমার সেন 'এও' শব্দটির উৎস পান : 'আইহ >আইয় > আইঅ > আই > এও।' এই শব্দগুলি একটি অর্থকেই সূচিত করে : যে নারীর স্বামী বর্তমান; সধবা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন 'এও' শব্দটি এসেছে 'আইও' থেকে। 'আইও' ও 'আইয়' শব্দ দুটি এক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে 'ধর্মমঙ্গল'

কাব্য থেকে 'আয়ত' (আইয়ত) শব্দটি নেন এবং এর অর্থ করেন : সধবাত্ব, এয়োত্ব, এয়োৎ। তিনি এই শব্দটির আরো অর্থ করেন : প্রসারিত, বিস্তৃত, আকৃষ্ট ইত্যাদি। 'আয়ত' শব্দটির খুব কাছের শব্দ 'আয়তন'। এর আরো কিছু অর্থ একসময় প্রচলিত ছিল যা আমরা ভুলে গেছি : আশ্রয়, গৃহ, বিশ্রামস্থান, মন্দির, বাসভূমি বা ভিটা, ব্যাধি, নিদান ইত্যাদি। অস্ট্রিক ভাষাতেও 'আতেন' শব্দটি আছে, যার অর্থ আশ্রয়।[২৩]

কবিতার ১ম স্তবকে লাল পথের দৈর্ঘ্য বোঝাতে কবি দূর, দিগন্ত ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি হিসেবে এয়োতী নারীর কল্পচিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে।

পটচিত্রের বৈশিষ্ট্যই কল্পচিত্র হয়ে উঠেছে 'কেবল তোমারই জন্য' কবিতাটিতে :

"... যেন কোনো পটচ্ছবিলীন
রমণীর চক্ষু যায়, পার হয়ে যায়
শ্যামলী মুখশ্রী তার, মুখের মলিন
উঠোন পেরিয়ে গিয়ে অশ্রুত দরজায়
যেন ওই করাঘাত সারা রাত্রি দিন

চোখেরই পলকপাত, একবার হারিয়ে ফেলেছে
তাই আর না হারায়, ভারি, অনিমিষ
চেয়ে আছে, চেয়ে আছে, ঘোমটার উন্মীলন সেজে
কেবল তোমারই জন্য সামগ্রী, জিনিশ।"[২৪]

('কেবল তোমারই জন্য' , 'অন্য যুগের সখা')

বাংলার পটচিত্রে দেখা যায় টানা চোখ। যে চোখের টান মুখের আয়তন ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় কান পর্যন্ত। 'শ্যামলী' শব্দের অনুষঙ্গে এসেছে 'মলিন' শব্দটি। 'মুখশ্রী' শব্দের অনুষঙ্গে এসেছে 'মুখের উঠোন' শব্দটি। 'শ্যামলী মুখশ্রী', 'মুখের মলিন উঠোন' ইত্যাদি কল্পচিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় গোবর দিয়ে নিকানো পরিষ্কার কালচে উঠোনের কথা। এখানে স্থির পটচিত্রটি আর

কিন্তু স্থির নেই। যেন হয়ে উঠেছে চলমান ছবি। 'রমণীর চক্ষু', 'শ্যামলী মুখশ্রী' পার হয়ে 'মুখের মলিন উঠোন' পেরিয়ে অশ্রুত দরজায় সারা দিনরাত কারাঘাত করে। হারানোর ভয়ে 'ভারি অনিমিষ চেয়ে' থাকা 'ঘোমটার উন্মীলন সেজে' সামগ্রীর দিকে, জিনিশের দিকে বিস্ফারিত চেয়ে থাকা যেন দীর্ঘদিন প্রতীক্ষায় রত কোন রমণীর কল্পচিত্রকে ফিরিয়ে দেয়। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের এই কল্পচিত্রগুলি বাংলা কবিতায় হয়ে উঠেছে মহা মূল্যবান সামগ্রী।

নিঃসঙ্গতা জীবনকে গ্রাস করেছে তাঁর 'মুক্তি' কবিতায়। ব্যথা-যন্ত্রণার নিঃসঙ্গ কল্পচিত্রগুলো তাই কবির কবিতায় ভাষা খোঁজে :

"বউটির মনে আছে সূর্য উঠলে নুয়ে পড়ে সেবারে জুনপুটে
ঘোমটা খশেছে আর আঁচল উড়ছে নোনা আঁশটে হাওয়ায়
ঝিনুক তুলছে আর তুলছেই, তারপরে সোজা হয়ে উঠে
দেমাকি চিবুক তুলে বলেছিল : এর থেকে মুক্তো পাওয়া যায়।

বাড়ি ফিরে একদিন ঝমঝম ভেবে সব খুচরো পয়সার
কৌটো খুলে দেখেছে সে জমে আছে একরাশ দুর্গন্ধ ঝিনুক;
বড়ো এক ফোঁটা জল অজানতেই চোখ থেকে ঝরে পড়ল তার ঃ
সেই থেকে মুক্তো নিজে, তাকে ঘিরে দুটি খোলা বন্ধ আর চুপ।[২৫]

('মুক্তি', 'দ্বিরাগমন')

কান্নার ভেতর দিয়ে শুরু ৮ পংক্তির 'মুক্তি' কবিতাটি। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই 'নোনা আঁশটে হাওয়ায়' বধূটিকে তুলতে হয় ঝিনুক। তার ঘোমটা খসে পড়ে, আঁচল উড়ে যায়। তবুও কর্মের বিরতি নেই। একটানা কাজ করার পর বধূটি ঝোঁকানো শরীর সোজা করে অহমিকার সুরে বলে :

"এর থেকে মুক্তো পাওয়া যায়।"

কবিতাটিতে ঘোমটা খসা, আঁচল ওড়া, 'আঁশটে হাওয়া', 'দেমাকি চিবুক' প্রভৃতি কল্পচিত্র বুক ভেঙে যাওয়া মানুষের আর্তস্বরকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

'মুক্তি' রূপান্তরিত হয়েছে 'মুক্তো'তে। 'একরাশ দুর্গন্ধ ঝিনুক' – কল্পচিত্রটি তুলে ধরে মানুষের কষ্টকে, গলায় আটকে যাওয়া কান্নাকে। কবিতাটি সম্পর্কে অপু দাস বলেছেন :

"বীতশোকের এখনের কবিতাকে খোলামেলা বললে শব্দশ্লেষে পটু এই কবির এ সংকলনের 'মুক্তি' কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেবে 'খোলা' শব্দটিকে 'ঝিনুকের খোলা' হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, তখন 'খোলা' একদিকে মুক্ত ('মুক্তো') অন্যদিকে 'বন্ধ আর চুপ'। এ হলো বৌদ্ধজেনদের মতো করে বলা। বীতশোকের অনেক কবিতাতে জেন কবিতার এরকম অনুরণন আছে। তাঁর কবিতায় বৌদ্ধ শূণ্যতার কথা ফিরে ফিরে এসেছে। বৌদ্ধ নির্বাণের ধারণায় নিভে যাওয়া এবং একই সঙ্গে দীপ্ত দৃপ্ত জ্বলে ওঠার অনুষঙ্গ আছে তা বীতশোককে বারবার টেনেছে।"[২৬]

শেষ পর্বের কবিতায় বীতশোক ভট্টাচার্য কল্পচিত্র থেকে মন্তাজের দিকে এগিয়ে গেছেন। মন্তাজ একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ একত্রীকরণ। অর্থাৎ একজন কবি তাঁর কবিতায় একাধিক ইমেজ বা দৃশ্যমান অংশ একস্থানে এনে যখন উপাদান অতিরিক্ত অন্য কোনো ভাবনা সৃষ্টি করেন তখন তার নাম হয় মন্তাজ। এখানে মাত্রার পরিবর্তন কেবল নয়, ঘাতের পরিবর্তন ঘটে। চলচ্চিত্রে এই মন্তাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বীতশোক ভট্টাচার্য চলচ্চিত্র থেকে কবিতায় সরাসরি মন্তাজ রীতি উপস্থিত করেছেন। তাঁর 'নিদালি' নামক দীর্ঘ কবিতাটি থেকে সামান্য একটু অংশ তুলে এটা বোঝানো যেতে পারে :

"বাবুইবাসার মতো খোঁপা দুলে ওঠে
মাথার ঘিলুর থেকে জোনাকির জৈব ভাস্বরতা
চিরন্তন যৌন গান জেগে ওঠে একবার সঙ্কেতে আভাষে
অবশেষে নিবে নিবে যায়
শাদা বামনের মতো হয়ে গেছে যেইসব নীল নক্ষত্রেরা
যেন বা শাশ্বত স্থির তাদের চেয়েও
যেন বা তাদের চেয়ে টানভালোবাসা কাকে বলে ভালো জানে
রাত্রে ঘুমায় না
কেবল শলমাজরি মুখ জুড়ে উন্মীলিত পরদা টেনে দেয়
ওড়না সরাও তুমি, শাহাজাদা, কার সঙ্গে কথা বলছ দ্যাখো
তোমার ঘুঙুর ধরে নাচিয়ে দিলেন তিনি ঘুম একপাক
একপাক মৃত্যু তুমি ঘাঘরা ওড়াও
মৃত্যুর স্বপ্ন অন্ধকার।[২৭]

('নিদালি' , 'নতুন কবিতা')

এখানে বাবুইবাসার মতো মেয়ের খোঁপা, জোনাকি, যৌনগান, সাদা বামনের মতো নক্ষত্র, শলমাজরি মুখ, শাহাজাদা, ঘুঙুর এবং মৃত্যু পাশাপাশি বসে ভিন্নঘাত সৃষ্টি করছে।

বাবুইবাসা তৈরি করে আর রাতেরবেলা জোনাকি এনে সে ঘরের ভেতর আলো জ্বালায়। বিজ্ঞানীরা বলেন বাবুইপাখির এমন আচরণ যৌনতার নামান্তর। বলাবাহুল্য 'নিদালি' কবিতায় এ প্রসঙ্গ কেন ? আসলে ঘুম বা নিদ্রা একদিকে মৃত্যুর নামান্তর অন্যদিকে নতুনভাবে বেঁচে ওঠার। তাই যৌনতার প্রসঙ্গ এসে যায় ঘুমের মধ্যে। তাছাড়া যে নক্ষত্রগুলো একদা আলো বিকিরণ করত একদিন সে হয়ে যায় শ্বেত বামন অর্থাৎ নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘটছে। যে বেঁচেছিল সে মৃত্যুতে হারিয়ে গেল। কিন্তু থেকে গেল সংসারের প্রতি বা উত্তর পুরুষের প্রতি তার ভালোবাসা। মানুষ মরে গিয়ে শেষ হয়ে যায় না। উত্তর পুরুষ তার ভাবনা বহন করে চলে। একদিন পৃথিবীর সমস্ত আলো ফুরিয়ে গেলে শ্বেত বামনদের মধ্যে নতুন করে আবার কোনো এক জগতের নির্মাণ হয়তো সম্ভব। তাই শলমাজরি মুখ আর উন্মিলীত পর্দা এ জগতে চিরকালই থেকে যাবে। মানুষের ভালোবাসা আছে বলেই জগৎ সংসার আজও বেঁচে আছে। ঘুঙুর অতীতেও বেজেছিল, আজও বাজছে আগামী দিনও বাজবে। ঘুম মৃত্যুর মতো নেমে আসে আবার ঘুম নতুনভাবে জাগিয়ে দেবে।

কবিতাটি ছোটো ছোটো দৃশ্য এবং ছবি নিয়ে ঘুম এবং মৃত্যুকে একঘাত থেকে আর একঘাতের দিকে পরিচালিত করে। সেখানে অন্য ঘাতটিতে জীবন এবং মৃত্যু, বেঁচে থাকা এবং হারিয়ে যাওয়া দুটোকেই একসঙ্গে চিত্রিত করে। তাই মন্তাজকে বলা যায় "A particular, process in creative assemblage of shots from which the greatest, finest and furthest result comes out."[২৮]

**ছন্দ —**

ছন্দ তো শৃঙ্খল। সমস্ত ছন্দই কবিতাকে একটি বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কাব্য কবিতার অনুভূতি প্রকাশ করতে, কবিতার বাইরের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে এবং ভেতরের চেতনার স্বরূপ প্রকাশ করতে সাহায্য করে ছন্দ। ছন্দ ধ্বনির সৌন্দর্য, কথার শিল্প। দৈনন্দিন এলোমেলো বলা মুখের কথায় সৃষ্ট ছন্দ। ছন্দ পদ্যেও থাকে আবার গদ্যেও।

প্রথাগত দিক থেকে ছন্দ তিন প্রকার —

ক) স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান  খ) মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান  গ) অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য প্রথাগত ছন্দ বিষয়ে মনে করেন :

"অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের সরলীকৃত বিভাজনে বাংলা কবিতার ছন্দের তারতম্য কখনো পরিপূর্ণভাবে ধরা দেবে না। পয়ার রীতির ধীরতা কেন সহসা মালঝাঁপের ক্ষিপ্রতায় পর্যবসিত কেনই বা ছড়ার ছন্দে চঞ্চল এই প্রাণস্বভাবটিকে পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য লোকায়ত কাব্যরীতির কাছে আবারও যাওয়া জরুরী।"[২৯]

লোকায়ত কাব্যরীতি হল লোকায়ত ছন্দ, লোকায়ত ছন্দ কথন - স্পন্দনের ছন্দ। থেমে থেমে কথা বলার ছন্দই কথন-স্পন্দনের ছন্দ। কথন-স্পন্দনের ছন্দ লোকগানের ছন্দ। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি লোকগান লোকসমাজের মানুষগুলি গায়। নিজের কথার স্পন্দন কবি নিজে অনুভব করেছেন। আর এই কথন-স্পন্দন থেকে শুরু হয়েছে গদ্য কবিতা।

বীতশোক ভট্টাচার্য প্রথাগত ছন্দ 'শিল্প', 'অন্যযুগের সখা' ইত্যাদি তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় ব্যবহার করেছেন। 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থের 'দীপান্তর', 'আনন্দে ফেরালে আজ' ইত্যাদি কবিতা মাত্রাবৃত্ত রীতিতে রচিত। দশটি ছত্রে সাজানো 'দীপান্তর' কবিতাটিতে আছে একধরনের বিবৃতিময়তা :

"দূরে দূরে ছাতে দীপাবলি জ্বলে ওঠে;
ছাতেরও উপরে জ্বলে উঠেছিল তারা;
তবু, নেমে এসো, অন্ধ, সময়হারা;
কোনো কথা নেই; শুধু কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে :
কতদিন আছো, কতকাল ঘরছাড়া !

আর তুমি নিজে কতকাল সংবৃত ?
উঠে আলো জ্বালো আজ এই নীল রাতে
বাড়ে ব্যবধান, দুটি হাত পোড়ে নি তো।
অবিকল এক-আমরণ সংঘাতে
জানু কেঁপে ছোঁয়, দীপাবলি দূর, ছাতে।"[৩০]

('দীপান্তর' , 'অন্যযুগের সখা')

কবিতাটিতে চারটি পদান্তিক মিল আছে। প্রথম পাঁচটি ছত্রে আছে দুটি (তারা – সময়হারা – ঘরছাড়া; ওঠে – ঠোঁটে)। শেষ পাঁচটি ছত্রে আছে দুটি (রাতে - সংঘাতে - ছাতে, সংবৃত - নি তো)। কবিতাটি আবেগ - বিহ্বল নয়। প্রথম জীবনে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর তীব্র আকুতি। কিন্তু দীপাবলীর দূরত্বের মতো সময়ের বিচ্ছিন্নতা আর একাকীত্বের চিত্র এঁকে কবি শেষ করেছেন কবিতাটি। সময় হারিয়ে যায়, তা আর ফেরে না। তাই স্মৃতিকে পুনরায় নতুন করে ধরে রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন নীল রাতে আলো জ্বালার মধ্য দিয়ে।

'আনন্দে ফেরালে আজ' কবিতাটিও মাত্রাবৃত্ত রীতিতে রচিত। এটি মিলযুক্ত প্রবহমান ছন্দ !

"কী আনন্দে ফেরালে এই সামগ্রীসমূহ আজ ফেরালে কী আনন্দে :
পাহাড়তলে জেগে উঠত ধাপে ধাপে তুষার-শহর, তুমি কী সুবর্ণে
কী রৌপ্যে তার রঙ ধরালে; এই ফোয়ারার পাথর আভার ছন্দে
সুর বাঁধল একটু সময় এবং তারপরে তাকে তার নিজস্ব স্বর্ণে
ফিরিয়ে দিলে কেমন করে; যে ছিল সে ছিল সহসা বাহুবন্ধে
ফিরেছিল; যেভাবে ফেরে মানুষ গৃহের গৃহীর গৃহদ্বন্দ্বে,
এবং তাদের উচ্চকিত সুস্পষ্ট অক্ষর যেন অনুবাদের বর্ণে
প্রত্যাহার করিয়ে নিলে, স্থগিত করিয়ে রেখে দ্বিপ্রহরের সন্ধে
কী আনন্দে ফেরালে সামগ্রীসমূহ আজ ফেরালে কী আনন্দে!"[৩১]

('আনন্দে ফেরালে আজ' , 'অন্যযুগের সখা')

এখানে চরণের অন্ত্যমিল আছে : (আনন্দে / ছন্দে / বাহুবন্ধে / গৃহদ্বন্দ্বে / সন্ধে / আনন্দে; সুবর্ণে / স্বর্ণে / বর্ণে)। শব্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্যনীয়: (ফেরালে / ফিরিয়ে দিলে / ফিরেছিল /ফেরে; করে /করিয়ে /করিয়ে; ধাপে / ধাপে।) শব্দের বৈপরীত্যও উপস্থিত : (স্বর্ণ / রৌপ্য; দ্বিপ্রহর / সন্ধে)। কবিতাটি আনন্দে থেকে ছন্দে, ছন্দে থেকে বাহুবন্ধে, বাহুবন্ধে থেকে গৃহদ্বন্দ্বে এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধেতে পরিক্রমণশীল।

কিন্তু 'এসেছি জলের কাছে' কবিতা গ্রন্থে তিনি এই প্রথাগত ছন্দের প্রথাকে অতিক্রম করলেন হয়তো বা জোশেফ ব্রদস্কির প্রেরণায়। কেননা ব্রদস্কি গদ্য কবিতা বা গদ্যের কথন নির্ভর

কবিতা লিখলেও অন্ত্যমিল দিয়ে চলেন পদ্যকবিতার মতো।[৩২]

বীতশোক ভট্টাচার্য সেইরকম একটি প্রয়াস এনেছেন বাংলা কবিতায় :

"আমার না এই বলার কিছুই নেই,
দ্যাখ আমায় তবু কথা বলাবেই ও।
কাঁদব না হেসে কাঁদব না বলতেই
হাসাবে কাঁদাবে, ভারি শিঙভাঙা গোঁ।"[৩৩] ('রাখালিয়া' , 'এসেছি জলের কাছে')

তাঁর 'এসেছি জলের কাছে' (১৯৮৬) থেকে এ প্রয়াস গড়িয়ে গেছে 'নতুন কবিতা' (১৯৯২) অবধি। এই পর্বে তিনি মিল রেখেছেন কিন্তু কথনকে কবিতা করে তুলেছেন। জ্যামিতির একটা সরলরেখার সূত্রকে ধরে তিনি 'বিয়ে' কবিতাটিকে প্রতিস্থাপন করলেন :

'ধরে নিলাম সোজা সরলভাবে
রেখা দুটি সমান্তরাল যাবে।
কিন্তু ধরো সরলরেখায় গিয়ে

অন্য কোথাও, ভিন্ন কোনওখানে
তার মানে কী ওরা দুজন জানে
একাগ্র মুখ মুখের কাছে নিয়ে
যা দেওয়া যায়: সঠিক ক্ষতিপূরণ।[৩৪]

('বিয়ে' , 'নতুন কবিতা')

যা মুখের কথা তাকে প্রথাগত ছন্দেও বাজিয়ে তোলা যায়।

পরবর্তীকালে তিনি এই মিলের বন্ধন থেকেও বেরিয়ে গেছেন যেখানে কেবল কথনটুকুই তাঁর বিশ্ব। এই সময়রে কবিতা দুই রীতিতে রচিত – গদ্য কবিতা হয়ে উঠল এবং কবিতা গদ্যের চেহারা পেল। উভয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাষার তরঙ্গিত ভঙ্গী অর্থাৎ বাক্‌স্পন্দন। বাক্‌স্পন্দনের উৎপত্তি লেখকের ভাবস্পন্দ বা বক্তার ভাবস্পন্দ থেকে। ভাষাকে তরঙ্গিত করে ঝোঁক এবং বিরতি। অর্থাৎ প্রস্বর এবং যতি। গদ্যকবিতায় থাকে ভাবগত স্পন্দন। এখানে পরিমিত ধ্বনিবিন্যাস না থাকলেও ভাবস্পন্দন অনুযায়ী ধ্বনিস্পন্দন থাকে তবে তা

'অনতিপ্রচ্ছন্ন' বা অনতিস্ফুট।[৩৫] গদ্যের বাক্‌পর্ব গঠিত হয় শব্দগুচ্ছ নিয়ে। তাই ধ্বনি সমষ্টি এখানে অনিয়ন্ত্রিত থাকে ও অপরিমিত থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন :

"গদ্য কবিতার বাক্‌স্পন্দ শুধু তার অন্তর্নিহিত ভাবস্পন্দেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাকে যথার্থ ছন্দস্পন্দ বলা যায় না। কেননা, তা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত ধ্বনিসমষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তেমনি গদ্যভাষার এমন কি গদ্য কবিতার ভাষার গতিভঙ্গীকেও যথার্থ ছন্দ বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই বলা যায় গদ্যরচনায় ছন্দপর্ব ও তার তরঙ্গিত গতিভঙ্গীর 'আভাসমাত্র' থাকে, তার সুনির্দিষ্ট ও সুপরিমিত ধ্বনিরূপটা থাকে না। তরঙ্গিত ছন্দপর্বের এই আভাসটুকুকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'। গদ্যরচনায় ছন্দোগতির ওই লীলাটুকুই থাকে, সুগঠিত ছন্দ থাকে না। রচনাভেদে এই লীলারও তারতম্য হয়। মোটামুটি বলা যায়, সাধারণ গদ্যে ভাষার স্পন্দন বা গতিলীলা থাকে অনির্দিষ্ট ও অস্ফুট; তাই তা অনুভবগম্য হয় না বললেই চলে। গদ্য কবিতার ভাষাতেও বাক্‌পর্ব থাকে অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিমিতি। কিন্তু তার গতিলীলা থাকে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট, তাই তা সহজেই অনুভবগম্য হয়।"[৩৬]

গদ্যকবিতা বৈচিত্র্যপ্রধান, স্বাধীন, মুক্তকবিতা। এখানে গদ্যের মধ্যে পদ্যের রঙ ধরানো হয়। এ প্রসঙ্গে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন :

"বাংলা গদ্যকবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্তকবিতা নয়। গদ্যকবিতার অনেক আগে ছন্দযতির হাত থেকে অর্থযতি মুক্তি পেয়েছে। কিছু কিছু গদ্যে কবিতা আছে, আর প্রায় সবই অনতিনিরুপিত ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়ে, স্বাধীন গদ্য কবিতা হয়ে ওঠে না।"[৩৭]

'অনতিনিরুপিত' ছন্দ গদ্যকাব্যের ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গদ্যকাব্য ছন্দকে বলেন 'অনতিনিরূপিত।'[৩৮]

গদ্যকবিতা নামটিকে আমরা দুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। গদ্যে লেখা কবিতা এবং কবিতাটি গদ্যের মতো। প্রথমেই আমরা আলোচনা করতে পারি 'অনতিনিরূপিত' অর্থাৎ গদ্যে লেখা কবিতা। 'কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে', যুধিষ্ঠির : 'বারাণাবতে ক্ষণেকের সাক্ষ্য থেকে', 'ভয় বিষয়ে চিঠি' প্রভৃতি কবিতা গদ্যে লেখা কবিতা। এই কবিতাগুলির কবিত্ব আছে, এদের ব্যঞ্জনাও মারাত্মক। এখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে :

"কখনও কেউ পড়বে না জানি, তবু কেন যেন মনে হয় কারও হাতে গিয়ে পড়বে।

হয়তো দু'আঙুলে তুলে নেবে একজন, ঢেউ দিয়ে খুলে ফেলবে একপাতা : তোমাকে দিলাম, তুমি, আমার কবিতা'। দ্যাখো তো, কবেকার কোন কথা, কোন মানে হয় এইভাবে মনে করানোর।' করুণায় হেসে উঠবে সে, ভুরু কুঁচকে ফেলবে ভুল করে : 'কতো ধরনের যে মানুষ আছে, কিরকম যে তাদের ধারণা। আর লিখবেই বা কী দিয়ে, সোনার দোয়াত কলম তো নেই, সে সব জানে সমালোচকেরা।'

তার সমবেদনাও হতে পারে একটু : আহা আজ আর কারুর হাতে নেই, এমন বাড়াবাড়ি করতে শিখিয়েছিলাম আমিই ওকে। আর সেই থেকে ঘণ্টার মতো বাজিয়ে দিয়েছে ও আমার নাম, প্রতিধ্বনি নামিয়ে দিয়েছে কান্নার দেওয়ালে। খেয়াল হলো আমার একদিন, হিল-তোলা জুতোর নিচে ডুবে গেছে তার উঁচুমুখ, ক্ষমার মতো লাল হয়ে আছে গোধূলিবেলা। সব আলো গাছের আড়ালে মুছে গেছে, আবছা লতাডাল সরিয়ে কাছে এল সে, রোগা আর ফরসা। আরো শাদা হয়ে ফিরে গেল সে, একদিন ও মিলিয়ে গেল কোথায়..."[৩৯]

('কোনো কবিতার বইয়ের ভূমিকার বদলে', 'অগ্রন্থিত কবিতা')

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন ব্যবহার করার জন্য যে গদ্যভাষা সৃষ্টি হয় তা কাব্যভাষা থেকে আলাদা। বীতশোক ভট্টাচার্য গদ্যে লিখতে চেয়েছেন এ কবিতা। কিন্তু গদ্যটি কবিতা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি দিন' গদ্য কবিতার মতো। গদ্য এখানে প্রতিদিনের মুখের ভাষা হয়েও মুখের ভাষাকে অতিক্রম করে কবিতার স্বরলিপিকে ছুঁয়ে ফেলেছে এবং হয়ে উঠছে বিশেষ রকমের কাব্যভাষা। সে কাব্যভাষায় একজন প্রেমিকের বিষাদময়তা চারিয়ে আছে। বিষাদময়তা ধরে রেখেছে বইয়ের উৎসর্গ পঙ্‌ক্তি যা শাদাপাতায় ঝলসানো বাক্য 'তোমাকে দিলাম, তুমি, আমার কবিতা'।

কবিতার সঙ্গে প্রেমের একটা সম্পর্ক আছে। যে কোনো কবি প্রথম জীবনে বেশ কিছু প্রেমের কবিতা লেখেন। তাই এ কবিতা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে নাটকীয় অ্যাকশন এসেছে মেয়েটির দিক থেকে, তাতে বিষাদঘন হয়ে প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে পাঠকের অন্তরে। পাঠক নিজেকে আর কবিকে আলাদা করতে পারছে না। এই মিলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথিত পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন। সেই মিলন শেষ পঙ্‌ক্তি ধরে রাখে এং প্রতি মুহূর্তে বাজিয়ে চলে :

'....'। সব আলো গাছের আড়ালে মুছে গেছে, আবছা লতা ডাল
সরিয়ে কাছে এল সে, রোগা আর ফরসা। আরো শাদা হয়ে ফিরে গেল সে, একদিনও
মিলিয়ে গেল কোথায়...'

এরপরের আলোচ্য বিষয় কবিতাটি হয়ে উঠেছে গদ্যের মতো। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'শম' কবিতা :

"হাওয়া উঠল শেষ রাতে, শব্দ করে খুলে গেল কপাট জানালা।
খোলা ঘর ফেলে রেখে বেরিয়ে এলাম আমি — ওই খালি ঘর।
এই শূণ্য আকাশ। ঊষা উঠছে সবে, দুটো একটা তারা ডুবছে।
আমি খুলে ফেলেছি শিরা স্নায়ুর পাশ : ক্ষয়কাশ আমার বাবার।
পিতামহীর থেকে গ্রহণী আমার, প্রবৃদ্ধ প্রপিতামহের অপস্মার।
রুগ্‌ণ আমি, নাও হাতে পরিয়ে দাও অর্জুনের ছাল, যবের তুষ, তিলের মঞ্জরী।
রুগ্‌ণ আমি, দাও আমাকে শুইয়ে দাও মাটির ওপর, হালের নিচে।
নমস্কার লিঙ্গ, নমস্কার লাঙ্গল, তোমাকে প্রণাম হে যুগনদ্ধদেবতা।
তোমাকে প্রণাম হে বীরর্ষভ, তোমাকে প্রণাম হে বীরুৎ।
কত রাত্রির রোগ যে আমার, অনাময় আমার এই ভোররাতে।[৪০]

('শম', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

বিরতিচিহ্ন যুক্ত দশ পংক্তির এই কবিতা মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত। গদ্যের ভঙ্গীতে সৃষ্ট। পর্ব, চরণ ও স্তবক নির্মাণে নির্দিষ্ট ছন্দের নিয়ম মানা হয়নি, কিন্তু রচনাটি শৃঙ্খলাহীন নয়। কবিতাটিতে দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের ভাষা বিদ্যমান। যেমন – 'কপাট', 'জানালা', 'রুগ্‌ণ', 'যবের তুষ', 'ক্ষয়কাশ', 'অর্জুনের ছাল', 'হালে' প্রভৃতি। শেষের পংক্তিগুলো যেন অর্থববেদ থেকে তুলে আনা হয়েছে। লোকায়ত জীবন এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মিলে যাচ্ছে। এখানে পঙ্‌ক্তির ভিতরে শব্দের মিল বা বুনন লক্ষ্য করা যায় : (পাশ / ক্ষয়কাশ; উঠছে / ডুবছে; বাবার/ অপস্মার; মাটির/ ওপর)। শব্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্যনীয় (রুগ্‌ণ আমি / রুগ্‌ণ আমি; নমস্কার / নমস্কার; তোমাকে প্রণাম / তোমাকে প্রণাম)। সমার্থক শব্দও এখানে

উপস্থিত। শব্দগুলি বারবার বিভিন্নরূপে ফিরে ফিরে আসছে: (খালি / শূণ্য; নমস্কার / প্রণাম; খুলে / খোলা)।

এরকমই আর একটি কবিতা 'নির্গ্রন্থ'। কবিতাটি ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে গেছে।

'নির্গ্রন্থ' কবিতাটি যেন গ্রন্থিহীন হয়ে উঠেছে :

"এককালে মস্করী গোশালের শিষ্য ছিলাম আমি।
তাঁর মতো নিয়তিবাদী হতে পারলাম না, এই আমার নিয়তি।
ভালো লাগল না নগ্ন আজীবিকদের সঙ্গে আমৃত্যু মশকরা।
হলুদ ধটী পরে দেশে ফিরে এলাম, ভাবলাম অজাতশত্রু রাজাই জাতশত্রু
ভালো লাগল না, আমাদের লিচ্ছবি বংশে রাজার সংখ্যা ৭৭০৭।
কেউ একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, এইসব অসংস্কৃত রাজা।
ভাবলাম কষায় পরব, শরণ নেব সংঘের।
অবাক কাণ্ড, আশি বছরের বুদ্ধ আমাকে দিল উপসম্পদা;
আমি তার শেষ শ্রাবক।
তারপর সুগত গেল, ভাবলাম ভালোই হলো।
ভালো লাগল না অভিধর্ম নিয়ে আনন্দ আর উপালির বিতণ্ডা।

এবার আমার ধর্ম আমার কাছে।
ভেবে ফিরে গেলাম বৈশালীতে।
ভেবেছিলাম প্রৌঢ় বিট হয়ে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।
কে বলেছে, বেশ করে তাই ওরা বেশ্যা।
রূপবাণ এক অনতিতরুণকে বারবার উলঙ্গ করেও ওদের শান্তি নেই।

ভাবছি তাহলে নগ্ন আজীবিকদের মধ্যে শান্তি আছে,
চাইলে ভিড়ে যাওয়া চলে দিগম্বর জৈনদের দলে।
হয়তো এতদিন মস্করীগোশাল বিগত, তার বন্ধু নাকি শত্রু মহাবীরও নেই
কিছুতে কিছু আসে যায় না, যাওয়া যায় গুরু সঞ্জয় বেলথিপুত্রের কাছে।
পকুধ কাত্যায়ণকে গুরু করে তার ককুদ নিয়ে খেলা করলে হয়।

কিংবা ফেরা যায় লিচ্ছবীদের মধ্যে;

অঙ্গ তোলা যায় বর্ম কবচ, মগধ রাজের বিরোধিতার অঙ্গীকার।

জিতে এসে বিছানায় ডাকা যায় সন্তানের মাকে;

হেরে এসে সটান শুয়ে পড়া যায় শ্মশানে।

ভ্রূণ হয়ে ফেরা যায় জঠরে।

ভালো লাগে না, ব্রাহ্মণদের জন্মান্তরের ধারণায় আমার আস্থা নেই।"[৪১]

('নির্গ্রন্থ' , 'প্রদোষের নীল ছায়া')

গ্রন্থিহীন কেন ? হারমান হেস জর্মন ঔপন্যাসিক। তাঁর একটি উপন্যাস – 'সিদ্ধার্থ'। বইটি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার পায়। এই বইয়ের নায়ক সিদ্ধার্থ। যে গৌতমবুদ্ধের সংস্পর্শে এসেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি এবং কোনো ধর্মকেই জীবনের অঙ্গ বা যাপনরীতিতে মেনে নেয়নি। সেই সিদ্ধার্থ গ্রন্থিহীন।

বীতশোক ভট্টাচার্যের 'নির্গ্রন্থ' কবিতায় সেই সিদ্ধার্থর ছায়া আছে। নির্গ্রন্থ শব্দটি 'গ্রন্থ' শব্দ থেকে এসেছে। পুরোনো দিনে তালের বা ভোজের পাতাকে সুতো দিয়ে গ্রন্থিবদ্ধ করা হত। সেই থেকে বদ্ধপাতাগুলি হয়ে উঠল গ্রন্থ। এখানের 'নির্গ্রন্থ' মানুষটি নেতি নেতি করে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বাসী — তাই বেঁচে থেকেছেন। এই বেঁচে থাকা লোকায়ত জীবনের বেঁচে থাকা। লোকের মধ্যে বা লোকসমাজের প্রতি আস্থা বিশেষ। তাই লোক বা মানুষের ধর্মহীন জীবন, বিশ্বাসহীন জীবন-যাপন বৃহত্তর চার্বাক বা লোকায়তিক বস্তুবাদী মানুষদের ইঙ্গিত করে। এ কবিতার মানুষ তাই প্রথার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কবিতাটিও প্রথাগত ছন্দকে (ধ্বনি, মাত্রা, স্বর) বাদ দিয়ে কথনভঙ্গীর পথে এগিয়েছে। যে কথা প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত, এ কবিতা তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়। 'প্রদোষের নীল ছায়া' কাব্যগ্রন্থে বীতশোক প্রথাগত ছন্দ থেকে এভাবেই সরে এসেছেন; যেখানে মানুষের জীবনও ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছে।

## তথ্যসূত্র

১। ওগুস্ত্ রদ্যাঁ (জন্ম ১২ নভেম্বর ১৮৪০ - মৃত্যু ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৭) উনিশ শতকের প্রধান ফরাসী ভাস্কর, যার অভিব্যক্তিমূলক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ভাস্কর্যে বাস্তববাদের গভীর সম্পর্ক আছে। উনিশ শতকের শেষভাগে রদ্যাঁর কাজ শিল্পের জগতে গভীর প্রভাব ফেলে। তাঁর 'দি এজ অব ব্রোঞ্জ', 'দি থিংকার', 'দি কিস' প্রভৃতি ভাস্কর্য এবং 'দ গেট্স্ অব হেল' নামক প্রকল্পের নকশা সৃজনশীল অনুপুঙ্খে ও ব্যঞ্জনাগর্ভ বিকৃতিতে মহীয়ান। তাঁর কাজ সময়ের তুলনায় এতটাই এগিয়ে ছিল যে, সবসময়ই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদিত ), 'পরিভাষাকোষ', সুজন , কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

২। 'দিনরাত্রি দুঃখের দেবতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থে ১৯৯১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩।

৩। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ', ভারবি, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ১৫৫।

৪। ড: রথীন্দ্ররায় (সম্পাদিত), 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ / ১৯৬৪ খ্রী:, পৃ. ৫৬৬।

৫। 'ঈশ্বর' কবিতাটি 'জলের তিলক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য ,'জলের তিলক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬৩।

৬। 'খরা' প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে 'জলের তিলক' গ্রন্থে।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'জলের তিলক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৬।

৭। ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার সংকলন 'অগ্রন্থিত কবিতা'। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের 'আমাকে তোমরা' কবিতাটি কবির 'অগ্রন্থিত কবিতা'য় আছে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩০৩।

৮। জাদুবিদ্যার সূচনা ও প্রভাববিস্তার হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ বছর থেকে শুরু হওয়া নতুন প্রস্তরযুগে। প্রযুক্তিকৌশলের খামতি আধাদৈবিক উপায়ে মেটাবার বাসনা থেকেই জাদুর আবির্ভাব।

শিল্প মাধ্যম হিসেবে জাদু, বিজ্ঞান ও শিল্প মনস্ক জাদুকরদের হাতে, দর্শকের চিত্ত বিনোদনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠে মধ্যযুগের পর থেকে। বিভিন্ন রাজসভায় ও সামন্ত ভবনে জাদুকররা জাদু প্রদর্শন করতেন — এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলির কিছু ছিল হাত-সাফাইয়ের খেলা, আর কিছু যন্ত্র নির্ভর ও প্রযুক্তিভিত্তিক পারফরমেন্স বা ইন্দ্রজাল, দু-ধরনের খেলাতেই প্যাটারিং বা অনর্গল বাচনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। উনিশ ও বিশ শতকে আউটডোর ম্যাজিকেরও বিশেষ প্রচলন হয়। আমেরিকায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং চীন জাপান ও ভারতে জাদুবিদ্যা একটি পরিশীলিত শিল্প ও বিনোদন মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। হুডিনি থেকে পি.সি. সরকার পর্যন্ত বিখ্যাত জাদুকরদের এক দীর্ঘ সারণি।

ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), 'পরিভাষাকোষ'; সিনেমা ও অন্যান্য দৃশ্যশিল্প মাধ্যম', সুজন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৫৫

৯। 'ফল' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'শিল্প' গ্রন্থে ১৯৮৬ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শিল্প', কালবেলা, তমলুক, ১৯৮৬, পৃ. ১০।

১০। 'অপর্ণা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'জলের তিলক' গ্রন্থে ২০০৩ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য, 'জলের তিলক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০।

১১। 'Imagisme' বানানটি সম্পর্কে তৎকালে ইংরেজীভাষী শিক্ষিত জনের আপত্তি ছিল, তার প্রমাণ একটি চিঠি:

"Sir: May I beg for a clear defination of the word 'Imagisme', as well as information as to whether it be in French, American or Colonial language? If it were in English, would there be the 'e' at the end? I do not think that Ezra Pound can be an Amercian, as he does not shun the 'Subjunctive mood' – yours truly, A.E.F. Horniman.

(We belive that 'Imagisme' comes from a city which all good Americans

are supposed to visit late or soon... ED)

Letter in T.P.'s weekly, 6 march 1915."

'Imagisme' বলতে ওনারা এভাবেই বোঝাতে চেয়েছিলেন 'Poetry' পত্রিকার ২১ অক্টোবর ১৯০৮ সংখ্যায়। কবিতার নিকট এই চারটি বিষয় চাওয়া হচ্ছিল :

1. To paint the thing as I see it.
2. Beauty.
3. Freedom from didacticism.
4. It is only good manners if you repeat a few other men to at least do it better or more briefly. Utter Originality is of course out of the question. (Page - 16; Introduction)

এরপরেও 'Poetry' পত্রিকার মার্চ, ১৯১৩ সংখ্যায় কবিতার নিকট দাবি করা হচ্ছিল এই তিনটি বিষয় ঃ

1. Direct treatment of the 'thing' whether subjective or objective.
2. To use absolutely no word that did not contribute to presentation.
3. As regarding rhythm: to compose in sequence of the musical phrase not in sequence of a metronome."

( PeterJones, 'Imagist Poetry'; Penguin Books, Middlesex, England, 1985.)

১২। 'সাহিত্যলোক', জানুয়ারী, ১৯৭১ গ্রন্থে 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র : রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক্‌প্রতিমা', 'ঘূর্ণচক্র জনতা সংঘ : একটি বাক্‌প্রতিমাগুচ্ছ' 'হে কালবৈশাখী : রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্‌প্রতিমা' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখেছেন। যেগুলি সেই সময়ের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।্য

১৩। অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' কর্তৃক 'প্রবন্ধ সগ্রহ' নামে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে প্রকাশ পায়। উপরোক্ত আলোচনায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেছেন :

"ইংরেজী 'ইমেজ' শব্দটি কাব্যমীমাংসার পারিভাষিক শব্দ, বিশেষ অর্থেই ওর ব্যবহার হয়। বাংলায় 'চিত্রকল্প' শব্দটিকেও ওইরকম পারিভাষিক বিশেষার্থবোধক শব্দ বলে গ্রাহ্য করে নেওয়া উচিত।"

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী,প্রকাশক - অশোক মুখোপাধ্যায়, কলকাতা,১৪০৪, পৃ. ৪২২-৪২৩,

১৫। তদেব, পৃ. ২৬১-২৬৫।

১৬। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ', ভারবি, কলকাতা,জানুয়ারী ১৯৯৩ পৃ. ১৫৩-১৫৫।

১৭। তদেব, পৃ. ১৬৩।

১৮। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'জীবনানন্দ', বাণীশিল্প, কলকাতা,ফেব্রুয়ারী, ২০০১, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

১৯। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা,জুলাই ২০০১, পৃ. ১৭।

২০। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'পদচিহ্ন চর্যাগীতি', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ৮০।

২১। সুকুমার সেন, 'চর্যাগীতি পদাবলী' , আনন্দ, কলকাতা,আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ৫৫-৫৬।

২২। বীতশোকভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা,জুলাই ২০০১, পৃ: ১৭৪।

২৩। 'নতুন কবি সম্মেলন', শারদীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত নিতাই জানার 'একটি কবিতা পাঠ ও প্রতিক্রিয়া,অক্টোবর ২০১৬, ।'

২৪। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা,জুলাই ২০০১, পৃ. ৫০।

২৫। তদেব, পৃ. ১১৫।

২৬। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা','অনুকথন: অপু দাস', 'বাণীশিল্প', কলকাতা,ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৩৬।

২৭। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'বাণীশিল্প', কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬৮।

২৮। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, 'চলচ্চিত্রের অভিধান', বাণীশিল্প, অক্টোবর ১৯৮১,

কলকাতা, পৃ. ৩৫৬।

২৯। বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ২৪

৩০। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', 'প্রতিভাস', কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৬১।

৩১। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা',প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৯।

৩২। Joseph Brodsky, 'To Urania: selected poems 1965-1985', 1965-1985, Penguin Books, 1977.

৩৩। বীতশোক ভট্টাচার্য, ' এসেছি জলের কাছে', অমৃতলোক; মেদিনীপুর, ১৩৯৩, পৃ. ১২।

৩৪। বীতশোক ভট্টাচার্য , ' নতুন কবিতা', তাম্রলিপ্ত, তমলুক, ১৯৯২, পৃ. ৫৭।

৩৫। প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দ পরিক্রমা', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭২,পৃ. ১৯।

৩৬। তদেব, পৃ. ২১।

৩৭। বীতশোক ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা ১৩৮৮, ভূমিকা অংশ।

৩৮। প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দ পরিক্রমা', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৯।

৩৯। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অগ্রন্থিত কবিতা', ১৯৭০-২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ. ৮২।

৪০। বীতশোক ভট্টাচার্য,' প্রদোষের নীল ছায়া', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৩।

৪১। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'প্রদোষের নীল ছায়া', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪১।